টুকরো কথার চিত্রকল্প
শুভশ্রী নন্দী

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ও বাতায়ণে আমাদের জীবন কুড়ি থেকে চারা হয়ে ফুলে ফলে উন্মিলীত বৃক্ষ রূপে সমাজ জীবনে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু বিদ্যালয় - বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, বাড়ী এবং সমাজ এই সমস্তই শিক্ষার মূল সূত্র বলে মনে হয়, এবং এর বিভিন্নতার আঙ্গিকেই গড়ে ওঠে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব। জীবনের ছোট ছোট বাঁক, গলি এদের হাত ধরেই মোড় নিই আমরা। এবড়ো খেবড়ো বেড়ে ওঠা গাছকে যেমন ছাঁটতে হয়, আসবাবে চাকচিক্য আনতে যেমন পালিশ করতে হয়, কারিগরি ও পুঁথিগত শিক্ষাও তেমনি যথেষ্ট নয় ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষের কবিতায় খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তাঁর মতে কোমল হীরে হচ্ছে বিদ্যে আর তার থেকে যে দ্যুতি বেরোয় তা হচ্ছে কালচার। বিদ্যের ভার আছে কিন্তু দ্যুতির নেই। এ প্রসঙ্গে কতগুলো ঝাঁকুনি দেয়া ঘটনা যা আমার মত এক সাধারণ ব্যক্তিত্বকে নাড়িয়ে ছিল তা বলার এবং সকলের সাথে ভাগ করার লোভ সংবরণ করতে পারছিনা।

চিত্রকল্প ১ :-শঠেশাঠ্যং

যখন ছোট ছিলাম তখন, বিশেষতঃ চিঠি লেখার সময় তারিখ ঠিকানা লিখতে গাফিলতি করতাম। আমার পারফেকশনিস্ট মা ক্রমশঃ ক্ষীণ বিরক্তি প্রকাশ করতে করতে প্রায় আমার ফাঁকিবাজির কাছে হার মানতে বসেছেন এমন অবস্থা। হঠাৎ বাড়ীতে একটি চিঠি আমারই নামে। খুলে দেখলাম, তারিখ - ঠিকানা আছে তো বটেই - নীচে চিঠির প্রেরিকা মা। তাতে লেখা, - 'শিক্ষা যে ক্রমশঃ জীবন বিচ্যুত হতে চলেছে তার স্বাক্ষর সবদিকে'। চিঠির ঠিকানা এবং তারিখ লেখার জন্য পরীক্ষাতে দুই মার্কস্ বরাদ্দ থাকে। সেটি পাবার জন্য আমরা পরীক্ষায় কোন গাফিলতি করিনা। কিন্তু জীবনে প্রয়োগ করার বেলা - এত অবহেলা। রবীন্দ্রনাথ একবার এলাহাবাদে এক স্কুল পরিদর্শনকালে একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেন, 'নদী কাহাকে বলে ?' আমাদের সকলের মতই বালকটিরও টেকনিক্যাল জ্ঞান ছিল, - পর্বত গাত্র থেকে উৎপন্ন হয়ে - সমতল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যা সমুদ্রগর্ভে উপনীত হয় - তাই নদী। কবি যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কখনো কোন নদী দেখেছে কিনা, - গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে দাঁড়াইয়া বালকটি নির্দ্বিধায় বলিল - সে কখনো নদী দেখে নাই !!!

জীবন বিচ্যুত শিক্ষার এই উদাহরণটি আমার শিশু বয়সের মূল ধরে এত নাড়া দিয়েছিল যে এখনও বহু চিঠি লেখা সম্পূর্ণ হয়না সময়ের অভাবে। আবার বহু চিঠি শুরু করার জন্য সাদা কাগজ টেনে নিয়ে বসলেও সংসার সমুদ্রের হাতছানিতে হয়তো ঝাঁপ দিই সেদিকে। কিন্তু ঘরের একোণে সেকোণে অ-শুরু অথবা অ-সম্পূর্ণ সাদা পাতার কোণে উঁকি দেওয়া ঝিলিক দেখতে পাই তারিখ আর ঠিকানা।

চিত্রকল্প ২ :- জয়জগৎ (পটভূমি শিলচর)

চলতি বিশ্বায়ণ শব্দটি তখনও এতটা জনপ্রিয় হয়নি। বাস্তবায়িত হওয়া দূরে থাক। শব্দটির নতুনত্বের চাকচিক্য আমাদের বসার ঘরে - বিতর্ক প্রতিযোগিতায় স্বোচ্চারিত হতে শুনি। আলোড়ন তোলে মনে। তখন ১৯৭৭ - আমি নেহাতই ছোট। বাড়ীতে আসতেন শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল দত্ত নামে এক ৭০ বৎসর বয়স্ক শুভ্র শ্মশ্রুমন্ডিত ভদ্রলোক। লাকুদা নামে পরিচিত। বহু বছর স্বাধীনতা সংগ্রামে জেল খেটেছেন। তাঁর সাথে গান্ধিজীর ছবিও দেখি। শিলচরে তিনি প্রাক্ প্রাথমিক শিশুশিক্ষা গবেষণা ব্যুরো খুলেছিলেন। যাহোক গ্রামের ছেলেদের নিয়ে খোলামাঠে বিদ্যালয় ছিল তাঁর। ছোট্ট আমি দেখেছিলাম এককোণায়, তাঁর গ্রামের হতদরিদ্র মলিণ জামাকাপড় পড়া ছেলেদের উপস্থিতি নেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেকটি শিশু 'উপস্থিত' বলার পরিবর্তে বলছে 'জয়জগৎ'। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীনতা তো সর্বজনবিদিত। কে যেন বলেছিলেন - বিশ্বজনীনতার আঙ্গিকে দেশাত্ববোধ অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত হবে একদিন।

বিশ্বনাগরিকতার দীক্ষায় অজান্তেই দীক্ষিত হয়েছি সেদিন। এত দূরে বাস করে দেশের অভাব ভয়ঙ্করভাবে বোধ করলেও সেই বিশ্বনাগরিকত্বের দীক্ষার আলোকবর্তিকা, সব হতাশা ছাপিয়ে ও ধুয়ে দিয়ে আত্মিকতাই দৃঢ় করে।

চিত্রকল্প ৩ :- শিক্ষা যখন শিলপপর্য্যায়ে

আমাকে ইংরেজী যিনি পড়াতে আসতেন - তিনি আমার বাবা - পিসী সকলকে পড়িয়েছেন। তাকে বলতাম 'দাদু'। সেই শশাঙ্কশেখর ভট্টাচার্য মহাশয় তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছিলেন। দু'তিন ঘন্টা ধরে তাঁর অবর্ণনীয় সাহিত্যে সাম্রাজ্যে বিচরণ ও বিবরণ মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতাম। পরবর্তী জীবনে ইতিহাস আমায় যেন নিশির ডাকের মত ডাকে। ভ্রমণের কথায় রক্তকণিকায় দামামা বাজে। এর বহু পর যখন ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় ঘোরার সুযোগ পেয়েছি - অবাক হয়ে ভেবেছি চোখে না দেখে, শুধু বই মারফৎ এমন জীবন্ত বর্ণনা চাক্ষুষ দেখেও তো আমি দিতে পারব না। শিক্ষার মাত্রা কোন শিলপ পর্য্যায়ে পৌঁছলে এ সম্ভব। কলেজে পড়িয়েছি তো আমিও - কিন্তু এধরণের ব্যাপকতা - গভীরতা - বিস্তৃতি কি সম্ভব ! তখনই মনে পড়ে তাঁরই আড্ডাচ্ছলে বলা একটি ঘটনা। একটি শিশু নাকি তাঁর দিদাকে স্কুল থেকে এসে বলছে :- (পাঠক-পাঠিকা মাপ করবেন - মূল রসটি যাতে আপনারা অনুভব করতে পারেন - ঠিক যেভাবে শুনেছি সেভাবেই ইংরেজীতে বলছি)

নাতনি - 'গ্র্যান্ডমা, আই হ্যাভ লার্নট, হাউ টু টেক অ্যান এগ।'

দিদা - 'হাউ' ?

নাতনি - 'টেক এন এগ, মেক এন অ্যাপারচার অ্যাট দ্য বেস এন্ড এ করেসপন্ডিং অ্যাপারচার অন দ্য অ্যাপেক্স। দেন ইনসার্ট ইওর মাউথ ইন এনি ওয়ান অফ দ্য অ্যাপারচারস ইনহেল দ্য এয়ার ফোরস্এবলি, দ্য সেলস্ গেট ডিসচারজড্।'

দিদা - 'মাই ডিয়ার চাইল্ড, ইন ওয়ান টাইমস্, উই ইউসড্ টু টেক অ্যান এগ অলসো।'

নাতনি - 'হাউ' ?

দিদা - 'উই নীড টু মেক হোল অন সাইডস্ এন্ড সাক্ '।

* পাঠকসমাজ মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

চিত্রকল্প ৪: - বসুধৈবকুটুম্বকম

আমি পৃথিবীর উত্তরপ্রান্তের একটি দেশ ফিন্ল্যান্ডে বেশ কয়েক বছর ছিলাম। একদিন ফিনিশ বন্ধু কাইয়ার সাথে হাঁটার সময় দেখলাম একটি গ্লাভ্ কে যেন সযত্নে চাপা দিয়ে রেখে গেছে। কাইয়ার কাছেই শুনলাম, কেউ বোধহয় ভুলে ফেলে গেছে গ্লাভ্টি, সেটি যাতে হাওয়ায় উড়ে

না যায় তাই কোন এক পথিক সযত্নে চাপা দিয়ে গেছে। এই ধরণের ঘটনা আমার হৃদয়কে নাড়া দেয় সবসময়েই। খুব উত্তেজিত হয়ে ভারতীয় বন্ধুটির কাছে বলতে গিয়ে শুনলাম তার সরস মন্তব্যে 'একটা বলেই চাপা দিয়ে গেছে - দুটো গ্লাভস্ পেলে পিটটান দিত।'

আমার দ্বিতীয় কন্যার জন্ম ফিন্‌ল্যান্ডে। ওখানকার এ্যাপার্টমেন্টে আমাদের সার্বজনীন লন্ড্রী রুম ছিল। অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন একটি সদ্য জন্মানো বাচ্চার কি প্রভূত পরিমাণ ধোয়ার সামগ্রী থাকতে পারে। আমিও দিনের বিভিন্ন সময়ে পর্বত প্রমাণ বোঝা নিয়ে ধুতে দিতাম মেশিন - এ। প্রতিদিনই অবাক হয়ে দেখতাম কে যেন আমার সমস্ত জামা ভাঁজ করে রেখে গেছে। প্রথম দিন অবাক হলেও - শেষে বোধদয় হল এ কোন নিশ্চয়ই একজনের কাজ নয়। কারণ দিনের বিভিন্ন সময়ে কেউ নিশ্চয়ই সবকাজ ফেলে আমার কাপড় ভাঁজের জন্য বসে থাকবে না। এ হচ্ছে জাতীয় চরিত্র। আমি একমাত্র বিদেশী ও ভারতীয় সেই এ্যাপার্টমেন্টে। দুটি ছোট বাচ্চা সামলাতে হিমসিম খাই তাই অনামী দয়াময়দের তরফে এই ভদ্রতা আমার দৈনন্দিন জীবনের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় আমি এক সৎ - সজ্জন - ভদ্র জাতি আবিষ্কার করতাম আর চমৎকৃত হতাম। এর বহু পরে সমীক্ষায় জানতে পারি সৎ ও সাধুতার লিস্টিতে ফিন্‌ল্যান্ড পৃথিবীতে প্রথম স্থানাধিকারী।

চিত্রকল্প ৫ :- 'আঘাত সেযে পরশ তব, সেই তো পুরস্কার'

বেশ ছোটবেলায় বন্ধুর সামান্য ছলনা বেশ মনোবেদনার কারণ হয়েছিল। একটা নোটখাতা না দেবার অজুহাত 'নেই, ভুলে গেছি' ইত্যাদি বহুদিন শুনে আবিস্কার করলাম ওটি দিতে অনিচ্ছুক সে। খুবই সাদামাটা ঘটনা। এই ধরনের প্রিয়জনের ছোটখাট আঘাতে আমরা চারপাশের পরিচিত সুজলা সুফলা পৃথিবীর রুক্ষতার সাথেও পরিচিত হই ও একটু একটু করে বড় হয়ে উঠি। কিন্তু সেই সংবেদনশীল বয়সে বাড়ীতে এসে একটু কান্নাকাটি করেছিলাম। সেটাই পৃথিবীর কালোদিকের সাথে প্রথম পরিচয় কিনা! তাও আবার প্রিয় বন্ধুর কাছ থেকে।

মনে পড়ে এক গাঢ় সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তের মুখে দিগন্ত। মা সূর্যকে দেখিয়ে আমায় বল্লেন - 'পৃথিবীর একপাশে যেমন কালো, আরেক পাশে তেমনি চোখ ঝলসানো আলো। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'। আরও বল্লেন ন্যায়শাস্ত্রের টিকাটীপ্পনি লেখক রঘুনাথ শিরোমণি এর কাহিনী। রঘুনাথ শিরোমণি যে টীকা লেখেন তা অত্যন্ত টেকনিক্যাল। খুব খুশী ও উত্তেজিত হয়ে তিনি দেখালেন চৈতন্যদেবকে। চৈতন্যদেবও উৎসাহিত হয়ে দেখালেন তাঁর বইখানি। রঘুনাথ কেঁদে ফেললেন বইটি দেখে। বললেন 'তোমার এ বই দেখে, আমার এ বই তো কেউ পড়বেনা। এত সরস ও সহজপাঠ্য।' একবাক্যে জলে নিক্ষেপ করলেন চৈতন্যদেব তাঁর বইখানি। বন্ধুত্বের খাতিরে অতল জলগর্ভে হারিয়ে গেল মহাসৃষ্টি। দপদপ করে অনির্বাণ উজ্জ্বল হয়ে রইল বন্ধুত্বের খাতিরে মহানতা।

পরিচ্ছেদ

জীবনে মহীয়ান আর মহানুভব কাহিনীর তো দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বাস্তবজীবনের ছুটন্ত ইঁদুর দৌড়ে শুধু চোখ মেলার সময় হয়ে ওঠেনা। বয়সের দাপটে মনও এমন পোড়খাওয়া যে ছাঁচ পড়ে না সহজে। ব্যক্তিজীবনের টানাপোড়েনে যখন কোন ঘটনা শেকড় ধরে নাড়া দেয় - স্ফুলিঙ্গের মত আলো হৃদয়কে প্রদীপময় করে তোলে, এইভাবেই বয়ে যায় জীবন নদী - 'মাঝেতে গোলাপ-গোলাপ এরূপ অনেক আলাপ'।

কতবার ভাবি যা কিছু মলিন তাকে ধোঁয়া হয়ে উড়ে যেতে দাও। মনে উদ্দিপীত রাখ উজ্জ্বল অমলিন শিখাটিকে। যদিও অন্তহীন প্রয়াস চলে অবিচ্ছিন্নভাবে মনমাঝে - কিন্তু সবসময় পারি কি ? আমার নিজেকে খুব সাধারণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে মনে হয় 'এখানে ঘটেনা কিছুই, তবু এক আশার পাষাণ বুকে নিয়ে - পিলসুজে পুড়ে যায় তেল' (আলমাহসুদ)। ব্যতিক্রম হলেই হয়তো নিপুণ ভাস্কর্য্যের মত গড়ে ওঠে সূক্ষ্ম ব্যক্তিত্ব। প্রকৃত শিক্ষা সেইসব জীবনের আনাচে কানাচে 'কথায় কাজে' ফোটায় সুরভিত অন্তহীন ফুলের মিছিল।

নতুন বছর আসে আর যায়

অরুনেন্দু চ্যাটার্জী

নতুন বছর আসে আর যায় ;
ফিরে ফিরে নিয়ে কত সঞ্চয়
পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখা
অজানা নতুন কত কী শেখা।
তবু হারায়ে মনের কোণে
অতি নিবিড় সঙ্গোপনে।
সব কথা যদি বলা হল
সবটুকু পথ যদি চলা হল
তবে কেন প্রত্যাশা
নতুন আলো, নতুন আশা ?

যা কিছু ফেলেছি পুরোনো ভেবে
যা কিছু হয় নি, হয়তো হবে
সব ভাবনারা একদিন উড়ে যাবে
নতুন আখিয়ার খোঁজে হারাবে
এই নতুন আলোর সন্ধিক্ষনে।
তবু ব্যথা জেগে থাকে মনে।

যা চলে গেল তা তো আর
ফিরে আসবে না কখনো আবার
স্মৃতি এক দুর্নিবার ছায়াছবি
অতীত তুলে আনে সবই।
মুছে দেওয়া যন্ত্রনার ভাষা
উচ্চকিত মুহূর্ত ভালোবাসা
জীবনের যত ওঠাপড়া,
দাঁতচাপা যত কাজ করা,
হাল ছাড়া পাল ভাঙা স্রোতে
ভেসে চলা তবু কোনমতে।

আলো পড়ে ভোরবেলার কৃষ্ণচূড়ায়
খেলা করে লাল ফুল সবুজ পাতায়,
নতুন বছর আসে আমার শহরে
বাসের জটলায় রাস্তার মোড়ে
নিত্য যাত্রীর ক্লান্ত মুখের আবছায়ায়
দোকানীর হালখাতা গোছানোর তাড়ায়,
মাঙ্গলিক শঙ্খে বছর শুরু অনেক ঘোরে
পয়লা বৈশাখ আসে আমার পরিচিত শহরে।

এই নির্জন প্রবাসে
যখন খুঁজি আশেপাশে
একখানি চেনা মুখ
অপ্রত্যাশিত দুঃখ সুখ
শুধু ভোলাবার আশায়
আমার চিরকালের মাতৃভাষায়,
এই টুকু শুধু মনে থাক
কাল সকাল হলেই পয়লা বৈশাখ।

সময়

সমর মিত্র

১৯৭০ সালের কাছাকাছি একটা দিনের কথা। সেদিন ক্লাসে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। ঘটনাটি কলম্বাসের আমেরিকায় পদার্পণের ব্যাপার নিয়ে। হঠাৎ একটি ছাত্র হাত তুলতে আমি আলোচনা বন্ধ করে তার দিকে তাকাতে ছেলেটি প্রশ্ন করল, 'স্যর, সময় বলতে আমরা কি বুঝি'? এই ধরণের প্রশ্ন আমার মাথায় আগে আসেনি তবে আইনস্টাইনের থিওরি অফ্ রিলেটিভিটি ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটু জ্ঞান ছিল, তা ছাড়া সে সময় ক্যাপ্টেন কার্কের স্টারট্রেক নামে একটি টিভির সিরিয়াল খুব দেখতাম। সেই সিরিয়ালের একটি ঘটনার কথাও ক্লাসে মনে পড়ে গেল। এন্টারপ্রাইজ্ স্পেসশিপে একবার ক্যাপ্টেন কার্ক তার কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে অন্য একটা টাইমহোয়ার্ফে চলে গেলেন। অন্যান্য আর সবাই আগের মতই আছে। দেখা গেল যে কার্করা চলাফেরা করছেন কিন্তু অন্যান্যরা স্থাণুর মত স্থির, কেউ কাউকে দেখতে শুনতে পাচ্ছেনা। এই দুটি ভাগের লোকেরা সময়ের বিভিন্ন মাপকাঠির মধ্যে পড়ে গেছে।

তেমনি আমরা যারা তিনটে ডাইমেনশানের মধ্যে বাস করি, ইচ্ছেমত ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে ওপরে নীচে যেমন খুশী নড়াচড়া করতে পারি তেমনি কেউ যদি সেইসঙ্গে অতীতে বা ভবিষ্যতেও গতায়াত করতে পারেন তাহলে তিনি আমাদের সামনে ইচ্ছামত আবির্ভূত বা অদৃশ্য হতে পারেন। ধরা যাক এই মুহূর্তে এই আমি যেখানে বসে লিখছি সেখানে আমার কাছে এসেছেন একজন যোগী, অতীত আর ভবিষ্যতে যাঁর অবাধ গতি। আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন সেই মহাপুরুষ, কিন্তু তিনি যেমন আমাদের মত পায়ে হেঁটে ঘরে ঢুকেছিলেন সেভাবে গেলেন না। সেই মুহূর্তে তিনি ১৯২৫ সালের একটি বিশেষ দিনে পৌঁছে গেছেন। তিনি সথান ত্যাগ করেননি কিন্তু। ঐ দিনটিতে এইখানকার ঘটনা জানার আগ্রহ হয়েছিল আমার। আমার কাছ থেকে তিনি তখন অন্তর্ধান করেছেন। একটু পরেই আবার আবির্ভূত হলেন তিনি, বললেন তিনি ঐ দিনটিতে সবেমাত্র এই বাড়ীটির তৈরীর কাজ শেষ করে বাড়ীর মালিক কোথায় কি আসবাব রাখবেন ভাবতে ভাবতে গৃহপ্রবেশের তোড়জোড় করছেন। আমার মনোভাব সর্বজ্ঞ মহাপুরুষের কাছে অজ্ঞাত থাকেনি। তিনি গৃহকর্তার পরিবারের অন্যান্যদের বর্ণনাও দিয়ে গেলেন।

এই সময় বা কাল, ক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের যাবতীয় পদার্থ বিচরণ করে চলেছে। কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোর তাগিদ নেই, শুধু চলা, চলার জন্যে চলা, থামা চলবে না। তাই এই জগতের জ্ঞান, ক্রিয়া বা গতির জ্ঞান। জগতে সৃষ্টি স্থিতি আর লয় নিরন্তর হয়ে চলেছে। সময় বা কালই তার কারণ - লোকানাম্ অন্তকৃৎ কালঃ ।

বাল্মীকির রামায়ণেও আমরা কালের এই পরিচয় পাই। সীতার অন্তর্ধানের পর শ্রীরামের পৃথিবীর কর্তব্য শেষ হয়েছে। তাঁকে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে বিধাতা কালপুরুষকে পাঠিয়েছেন। তিনি আত্মপরিচয় দিচ্ছেন - পিতামহেন দেবেন প্রেষিতোঽস্মি মহাবলঃ -------- কালঃ সর্বসমাহরঃ, অর্থাৎ লোকপিতামহ ব্রহ্মা আমাকে পাঠিয়েছেন, আমি মহাবলশালী ও সর্বসমাহর বা সর্ববস্তুর সংহারকর্তা কাল । এই কাল অবিনাশী, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন - কালঃ কলয়তাম্ অহম্ - অর্থাৎ গণনাকারীদের (উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশের সময়ের হিসেবরক্ষক) মধ্যে আমি কাল (১০:৩০), আবার একটু পরেই বলেছেন - অহমেবাক্ষয়ঃ কালঃ - আমিই অক্ষয় কাল (১০:৩৩)।

কিন্তু এই কালের আরো বিশেষ একটি রূপ আছে যেটির পরিচয় পেতে হলে সাধনার প্রয়োজন। সেই সাধনায় সফল হলে যে রূপ দেখতে পাওয়া যাবে স্টারট্রেকের ঐ দৃশ্যে তার ইঙ্গিত রয়েছে। মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসমুনি স্বয়ং যেখানে সেখানে আবির্ভূত হতেন, অন্তর্ধানও করতেন, সেই সব ঘটনা স্টারট্রেকের লোকজনদের 'বিম্ আপ বিম্ ডাউন' এর মত। আমাদের কাছে ঐ সব ঘটনা আজগুবি মনে হলেও বর্ত্তমান কালেও যে তার প্রমাণ রয়েছে সেটা জানতে পেরেছি অনেক পরে। প্রথম প্রথম এসব অবিশ্বাস্য বলে আমিও মনে করতাম। তবে ভারত ও বাঙালীর গৌরব গোপীনাথ কবিরাজের লেখা শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্য যোগত্রয়ানন্দের জীবনী পড়ে সেই সন্দেহের নিরসন হয়েছে। যাদের সেই জীবনী পড়ার সৌভাগ্য হয়নি তাদের অবগতির জন্যে জানাই যে শশিশেখর সান্যাল ওরফে যোগত্রয়ানন্দ তথাকথিত সন্ন্যাসী ছিলেন না, তিনি গৃহী ছিলেন, কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিন যোগের ঐশ্বর্য্যে ভূষিত হয়েছিলেন বলে তৎকালীন সমাজে তিনি যোগত্রয়ানন্দ নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

আমাদের শাস্ত্রের ভান্ডার বিশাল, অথচ, কোন শাস্ত্রে যে তাঁর পারদর্শিতার অভাব ছিল তা বলা যায়না। অল্পবয়সে পাণিনির ব্যাকরণের ওপর পতন্জলির লেখা মহাভাষ্য পড়ার বাসনা নিয়ে তিনি কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের কাছে সবিনয়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলে। ঐ ভাষ্য অধিগত করতে হলে সুযোগ্য শিক্ষকের কাছে পাঠ নিতে হয়। তাঁর কর্মফলে সেই অধ্যক্ষের কাছে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তিনি চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ী ফিরে উপবাসী অবস্থায় ঠাকুরঘরের দরজায় খিল দিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। তারপরের ঘটনা রোমহর্ষক। গোপীনাথ কবিরাজের সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ বইখানির ২য় খন্ডে তার বিবরণ এইরকম - 'ঐ রাত্রেই তিনি মহানিশার পরে একজন মহাপুরুষের দর্শনলাভ করেন ---- দিব্য জ্যোতির্ময় দেহ, শান্ত ও প্রসন্ন মুখমন্ডল --- গৃহদ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ ছিল, মহাপুরুষ এই গভীর নিশীথে এই অন্ধকার গৃহে প্রবিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরটি যেন আলোকিত হইয়া উঠিল --- মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস, এত ক্ষুব্ধ হইয়াছ কেন ? --- কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি তোমার জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করিতে সম্মত হয় নাই, তাই কি তোমার এই অভিমান ? ---- আজ আমি তোমাকে ব্যাকরণ ভাষ্যের রহস্য শিক্ষা দিব। আমি গ্রন্থ রচনা করিয়াছি ---।' অপরিণতবয়স্ক হলেও শশিশেখর বুঝতে পারলেন যে এই আবির্ভূত পুরুষ স্বয়ং ভগবান পতন্জলিদেব, --- মহাপুরুষ ব্যাকরণ আগমের জটিল রহস্য তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। বলিতে কি বিশাল ভাষ্যের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত প্রায় সমস্তটাই তিনি সংক্ষিপ্তভাবে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। ---- যখন মহাপুরুষ তাঁহার গৃহ হইতে অন্তর্ধান করিলেন ---- দেখিলেন যে তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাবের মধ্যে খুব বেশী সময়ের ব্যবধান ছিলনা -- আমরা সাধারণতঃ কালের যে মানে অবস্থিত থাকি ইহা তার অপেক্ষা সূক্ষতর মান, ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। --- তিনি তাঁহার উপলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষা করিবার জন্য গ্রন্থ খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষের তত্ত্ব ব্যাখ্যাগুলি --- পরিস্ফুট পূর্বস্মৃতিরূপে তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। তারপরে গোপীনাথ কবিরাজ লিখছেন, 'আমি বাবাজীর মুখ হইতে ভগবান পতন্জলির ব্যাখ্যার কোন কোন অংশ শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম।

কালের সূক্ষ্মতর মানের বিশ্বাসযোগ্য আরো একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। যোগীরাজ লাহিড়ীমশাইয়ের শিষ্য শ্রীযুক্তেশ্বর গুরুর নির্দেশে যাঁকে আমেরিকায় ক্রিয়াযোগ শিক্ষা দেবার জন্যে প্রস্তুত করেছিলেন, সেই ভারতবিখ্যাত বাংলার গৌরব এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় Self Realization Center এর প্রতিষ্ঠাতা স্বামী যোগানন্দ বহুজনপাঠ্য The Autobiography of a Yogi বইয়ের লেখক। তাঁর গুরুদেব

মরদেহ পরিত্যাগের কিছু পরে বোম্বাই শহরের এক হোটেলের ঘরে স্থূলদেহ ধারণ করে তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন। আর যে সূক্ষ্মলোক থেকে তিনি তাঁকে এই দুর্লভ দর্শনের সৌভাগ্যের অধিকারী করেছিলেন তার অত্যাশ্চর্য্য বিবরণ সেই বইখানিতে স্বামী যোগানন্দ লিপিব্ধ করেছেন।

বদ্ধ ঘরে অকস্মাৎ গুরুদেবের আবির্ভাবে যোগানন্দ তেমন আশ্চর্য্যবোধ করেননি, কারণ জীবিতাবস্থায়ও শ্রীযুক্তেশ্বর তাঁকে বেশ কয়েকবার ঐভাবে দর্শন দিয়েছেন। আশ্চর্য্য হবার শেষ ওখানে নয়। এরপরে তাঁর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্তেশ্বর পরলোকে তাঁর অভিজ্ঞতা ও তাঁর কর্ত্তব্যের বিশদ বিবরণ দিলেন। যোগানন্দ লিখছেন যে একটু পরেই তাঁদের আলোচনা অপার্থিব সময়ের মানে চলতে থাকল, পার্থিব সময়ের মান অনুযায়ী খুব সামান্য সময়ের মধ্যে সেই দীর্ঘ আলোচনা শেষ করে গুরুদেব অন্তর্হিত হলেন।
এই পরিপ্রেক্ষিতে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ শুরু হবার সময়কার একটি বিশেষ ঘটনা বুঝতে পারা যায়। যদিও মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসমুনি সে সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেননি। ঘটনাটি হল উভয়পক্ষের সৈন্যসমাবেশে আত্মীয় স্বজন আর পরিচিত বান্ধবদের দেখতে পেয়ে কি করে এদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন তাই ভেবে অর্জুন যখন ধনুর্বাণ ফেলে দিয়ে বিষন্নমনে রথের ওপর বসে পড়লেন। ঐরকম অক্ষত্রিয়সুলভ আচরণ দেখে অর্জুনের সারথি শ্রীকৃষ্ণ র্ভৎসনার সঙ্গে উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন, দিতে লাগলেন অর্জুনের প্রতিপ্রশ্নের উত্তর। সেই কাহিনী দিয়ে আমাদের সুপরিচিত শাস্ত্র ভগবদ্গীতার সৃষ্টি। আমরা জানি এই দুজনের বাদানুবাদ যতক্ষণ ধরে চলেছিল ততক্ষণ দুই সেনাদল অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধ শুরু করার নির্দেশের অপেক্ষা করছিল। জাগতিক সময়ের মানে সম্পর্ণ গীতা পাঠ করতে তিনঘন্টা সময় লাগে। ততক্ষণ ঐ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যসামন্ত স্থাণূর মত দাঁড়িয়ে রইল তা অবাস্তব বলেই মনে করা যেতে পারে। অতএব যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনের কথোপকথন, প্রথম কিছুক্ষণ হয়তো আমাদের মত চলেছিল কিন্তু একটু পরে নিশ্চয়ই ঐ আলোচনা অপার্থিব সময়ের মানে সম্ভবতঃ কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সমাধা হয়েছিল।

এসব কথা সেদিন ক্লাসে বলতে পারিনি, দৃষ্টান্তগুলো সব আমার তেমনভাবে জানাও ছিল না, আর যদিও বা থাকত, বললেও ওরা বুঝতে পারত না। ওদের কাছে স্টারট্রেকের উদাহরণটা আর সেই সঙ্গে রিলেটিভিটি থিওরির দুচারটে কথাই বোধহয় যথেষ্ট হয়েছিল।

"Death is not extinguishing the light; it is putting out the lamp because dawn has come."

--Rabindranath Tagore

রাজার মালতী

সুস্মিতা মহলানবীশ

ছন্দের কথা বলো তুমি রাজা সাহেব
ছন্দের মানে বোঝ কি ?
মালতীর জীবনে ছন্দপতন করাল কে ?

তুমি রাজা ভাবলে মহৎ দিলটা নিয়ে -
বড় কষ্ট দিলীপের মায়ের, মালতী আর শম্পাকে নিয়ে-

লেপাপোছা মালতী, ভোঁতা মাথা ঘসে
স্কুলের গন্ডি ছেড়েছে
মন্দ কি আর, নিজ কক্ষে এনে সঙ্গী তার রাখবে তাকে।

সঙ্গী না বন্দী করলে - হীরে মানিক্য ও সোনার শিকল দিয়ে।
বছর আষ্টেকের মধ্যে তিন সন্তানের জনক হলে,
মালতীকে পাল্টে দিলে -
অতীত বা শম্পার কথা ভাবতে পারে কি সে!

তোমার মহত্ত্বে বাঁধভাঙ্গা সুখের জোয়ারে
ভেসে গেল সে -
দূর থেকে তারে, ডাক দিলে রাজা -
'উজানে নয়, ভাঁটায় এসো - অথর্ব আজ আমি যে।'
বাঁধভাঙ্গা জলে মালতী কি আর
ফিরে আসতে পারে ?

সময়ের রেলগাড়ী

সুস্মিতা মহলানবীশ

সময়ের রেলগাড়ীটা
বিরাট বড় সেতুর ওপর দিয়ে
মন্থর গতিতে চলে -

ওপারে যেতে হলে উপবিষ্ট যাত্রীরা কি বোঝে
কতটা এলো?

আমি অর্ধেকটা পথ চলে আসা
সেতুর পেছন দিকে তাকিয়ে দেখি
কি ফেলে এসেছি ! (আমিও যে যাত্রী)

কিছুই কি সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ছিলনা,
ফিরে আসব বলে আর যে ফিরে যেতে পারিনা ?

সময়ের রেলগাড়ীটা বিরাট সেতুর ওপর
দিয়ে মন্থর গতিতে চলে -

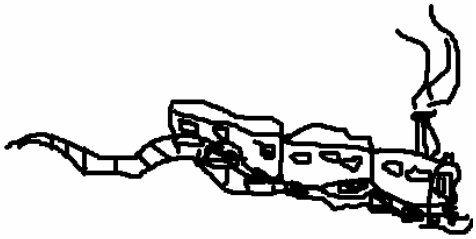

ঝড়

প্রসেনজিৎ দত্ত

অনেক যুগ আগেকার কথা। ভারত স্বাধীন হয়েছে ঠিকই, তবে দেশের অন্যান্য বড় শহরের মতো কলকাতাতে তখনও রয়েছে বেশ কিছু বৃটিশের বসবাস। এদের মধ্যে বেশীরভাগই ছিল ব্যবসায়ী কারনে, তবে কিছুজন থেকে গিয়েছিল ক'লকাতা শহরকে ভালোবেসে। কেউ কেউ অবশ্য ছিল এই কারনে যে তাদের নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার মতো আর কোন পিছুটান ছিল না। এরা প্রায় সকলেই ছিল বিত্তবান। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল এদের বসবাস। কেউ থাকত আলীপুরে, কেউ বালীগঞ্জে, কেউ হেসটিংসে, আবার কেউ ওয়েলেসলীতে। এরকমই একজন ইংরেজ ব্যবসায়ী ছিলেন চার্লস ওয়াটস। নিজস্ব এবং ভারত সরকার ও পশ্চীমবঙ্গ সরকারের যৌথ উদ্যোগে বেশ কিছু কলকারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ছিল তাঁর কলকাতা শহরে। এই সব প্রতিষ্ঠানগুলিতে এক সময় প্রায় তিন হাজার কর্মী কাজ করতেন। লম্বা দোহারা চেহারা সাহেবের, লাল মুখ, সেই মুখে সবসময়ই পাইপ ঝুলছে। সাদা ধবধবে জামা, সাসপেন্ডার দিয়ে পড়া প্যান্ট, পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে মনে হত, একটা মানুষ গেল বটে! রোজ সকালে ব্যায়াম করতেন আর রবিবার হলেই ময়দানে চলে যেতেন ঘোড়ায় চেপে ঘোড়দৌড় করার জন্য।

কলকাতা শহর তখনও ছিল সুন্দর, ছিমছাম। বৃটিশরা লন্ডনের আদলে গড়েছিল একে, দ্বিতীয় লন্ডন হিসাবে এই শহরের নামও ছিল বেশ। বহু স্বনামধন্য মনীষী ও বুদ্ধিজীবীরা এই শহরকে নিজের বাসস্থান বলে মেনে নিয়েছিলেন। বিশ্বের অনেক নামকরা সংস্থার কার্য্যালয়ও ছিল এখানে। দিল্লী রাজধানী হলেও বাণিজ্য, সংস্কৃতি ও ফ্যাশনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কলকাতা। স্বাধীনতার আগে এই শহরের ইংরেজ অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে সাধারণ নাগরিকদের চলাফেরার ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রন ছিল প্রশাসনের। রোজ সকালে এর প্রধান প্রধান সড়কগুলি ধোয়া হ'ত জল দিয়ে। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কর্মাধক্ষ্যদের নেতৃত্বে সারারাতব্যাপী কাজ চলতো সড়ক নির্মান ও মেরামতের জন্য, যাতে সকালে গাড়ী চলাচলের সাবলীল গতিতে বাধা না পড়ে। শহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখে তাক লেগে যেত।

পরাশর রক্ষিত থাকতেন হাওড়া শহরে তাঁর নিজস্ব পৈতৃক বাসস্থানে। বহু প্রজন্ম ধরে ওঁদের পরিবারবর্গের ওই এলাকাতেই বসবাস। নানা কারনে ইচ্ছে থাকলেও বিয়ে করে ওঠা হয়নি পরাশরের। পেশায় ছিলেন অ্যাকাউনটেন্ট, একটা স্থানীয় সংস্থায় কাজ করতেন, কিন্তু অসম্ভব দক্ষ ছিলেন কাজে। থাকতেন হাওড়ায়, কিন্তু মন পড়ে থাকত কললোলিনী তিলোত্তমা কলকাতার দিকে। সুযোগ পেলেই হাওড়া ব্রীজ পার করে চলে যেতেন কলকাতা শহরে। মুগ্ধ নয়নে উপভোগ করতেন শহরের চাকচিক্য আর অবাক হয়ে দেখতেন বিশাল বিশাল ইমারতগুলোকে। মনে মনে ভাবতেন, এই শহরে কাজ করার যদি কোনদিন সুযোগ পান, তবে জীবনটা যেন ধন্য হয়ে যায়। সুযোগ আসতে বেশি সময় লাগল না। গত দুবছর ধরে শহরের বিভিন্ন সংস্থায় আবেদন জানিয়েছেন, ইন্টারভিউ তো দূরের কথা, কোনদিন আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকার করে একটা চিঠিও আসে নি। তাই হঠাৎ মেলবক্সে টাইপ করা সাদা খামটা দেখে আনন্দে, উত্তেজনায় ও একটা অজানা আশঙ্কায় যেন দিশাহারা হয়ে পড়লেন। চিঠিটা বার করে নিজের মনেই গান গেয়ে উঠলেন। ভাই সহদেব ঘর থেকে বেড়িয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, ''কী হয়েছে দাদা?''। ওদিক থেকে ওঁর বোন, কাকা ও মাও বেড়িয়ে এলেন। সবার মুখে এক কথা, ''কী, কোনো সুখবর আছে''? এ গাল হেসে পরাশর বললেন, ''ইন্টারভিউ -এর ডাক পেয়েছি কলকাতা থেকে''!!!

ওরিয়েন্টাল মারকেন্টাইল লিমিটেডের সুসজ্জিত অফিসে বসে পরাশর ভাবলেন, ''স্বপ্ন দেখছি না তো''? মিঃ ওয়াটসের সমস্ত সংস্থার এটাই প্রধান কার্য্যালয়। ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পড়ে লাইন দিয়ে বসে কর্মীরা কাজ করছে, উচ্চপদস্থ কর্মীরা ইস্তিরি করা স্যুট টাই পড়ে ঘোরাঘুরি করছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার মীটিং -এ বসে আলোচনা করছেন। বিশাল হলঘরে আর্দালীরা হাতে চা, জল বা খাবার নিয়ে একদিক থেকে আরেক দিকে যাচ্ছে অথবা আসবাবপত্র ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার পরিচছন্ন রাখছে। অনেক উঁচুতে লম্বা লম্বা রড থেকে পরপর বিশাল বিশাল সীলিং ফ্যান ঝুলছে, ঘরের আনাচে কানাচে নানারকম গাছ দিয়ে সাজানো। বিশাল বিশাল দেওয়ালগুলো থেকে ভারতীয় ও ইউরোপীয় কলার নিদর্শন বহন ক'রে বড় বড় ট্যাপেস্ট্রী ঝুলছে। বড় কাঁচের ফ্রেঞ্চ উইন্ডোগুলো দিয়ে আলো এসে পড়ে গোটা অফিসটাকে উদ্ভাসীত করে রেখেছে। এইসবই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন পরাশর, তাই প্রথম যখন তাঁর নাম ডাকা হ'ল, তিনি তা শুনতেই পান নি। হঠাৎই একজন আর্দালী ওঁর কাছে এসে বলল, ''বড়বাবু আপনাকে ডাকছেন''। চটক ভেঙে যেতেই এক ঝটকায় উঠে আর্দালীর নির্দেশ লক্ষ্য করে এগোতে শুরু করলেন অফিসের বড়বাবু শিবকালী বাঁড়ুজ্জ্যের ঘরের দিকে।

ইন্টারভিউ পর্ব শেষ হলো। প্রথমে বড়বাবু, তারপর চীফ অ্যাকাউনটেন্ট সন্দীপন মিত্র এবং সবশেষে খোদ মিঃ ওয়াটস -এর সাথে। পরাশর বাড়ি চলে এলেন। কথাবার্তা তো ভালোই হয়েছে, এখন চাকরীটা হলে হয়! একটা অজানা চিন্তায়, ভাবনায় দিন কাটতে লাগল। কিন্তু সব চিন্তা ভাবনাকে সাঙ্গ করে দিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যেই চলে এলো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার, মাসে চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরীর। আনন্দে আত্মহারা হয়ে সেদিন রাত্রে ঘুমই হল না পরাশরের। চিঠিতে পরের সপ্তাহে সোমবার ন'টার থেকে চাকরীতে যোগদানের নির্দেশ, ঠিক করলেন নতুন জামাকাপড় কিনে ফিটফাট হয়ে একটু আগে আগেই পৌঁছে যাবেন। এরপর কয়েক বছর কেটে গেছে। খুব মন দিয়ে পরিপাটি করে কাজ করেন পরাশর। অফিসে যাতে সময়মতো পৌঁছতে পারেন, তার জন্য কাছাকাছি একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন। সপ্তাহের শেষে কখনো সখনো পৈত্রিক বাড়ীতে গিয়ে থেকে আসেন। ওঁর কাজে খুশী হয়ে কর্তৃপক্ষ ওঁকে একটা প্রমোশনও দিয়েছেন, মাইনেও বেড়েছে। এরকমই একদিন কাজের তাগিদে একটু দেরী করে অফিসে আছেন, একটা হিসাব কিছুতেই মিলছে না, সেটাকে মেলানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। উনি ছাড়া আছেন আরও দু'একজন কর্মী, এছাড়া নিচে গেটের কাছে আছে দারোয়ান বাঞ্ছারাম। এই মুহূর্তে অবশ্য সে সংলগ্ন সার্ভেন্টস কোয়ার্টার্সে ওর পরিবারের সাথে বসে রাতের খাবার খেতে গেছে। একসময় একটা ছোট বিরতি নিয়ে উঠে পরাশর জানলার কাছে গেলেন একটা সিগারেট ধরানোর জন্য। জানলা দিয়ে একটা সুন্দর ঠান্ডা হাওয়া এসে মুখ চোখে লেগে ওঁর সারাদিনের ক্লান্তি আর গ্লানীকে যেন দূর করে দিল। সিগারেটটা ধরিয়ে একটা সুখটান দিয়ে মাথাটা বার করে চারদিকটা দেখছেন, হঠাৎ ছাদের ওপর থেকে একটা বাচ্চার চিৎকার শুনে চমকে উঠে দেখলেন, একটা অল্পবয়স্কা মেয়ে একটা কোলের শিশুকে নিয়ে আশঙ্কাজনকভাবে ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। পরাশর কিছু বলার আগেই মেয়েটা বাচ্চাটাকে হাত থেকে ছেড়ে দিল। যেন সহজাতভাবেই পরাশরের হাত থেকে সিগারেটটা পড়ে গিয়ে ওঁর হাত দুটো এগিয়ে গেল বাচ্চাটাকে ধরার জন্য। বাচ্চাটা হাতে এসে পড়তেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি ওকে বুকের কাছে টেনে নিলেন। ততক্ষণে অফিসের আর দু'একজন যে কর্মী ছিলেন, তাঁরাও দৌড়ে এসেছেন পরাশরকে সাহায্য করার জন্য। ওঁরা ধ'রে পরাশরকে একটা চেয়ারে বসালেন। এরপর যে ঘটনা ঘটলো তা ভাষায় বর্ণনা করা দুরুহ। পরাশর সবে ইঙ্গিত করে অন্যান্যদের বোঝাতে চেষ্টা করছেন ছাদে মেয়েটার সাহায্যার্থে যেতে, হঠাৎ চোখের কোনা দিয়ে দেখলেন খোলা জানলাটার সামনে দিয়ে খুব দ্রুতগতিতে কি একটা নিচের দিকে নেমে গেল। হায় হায় করে উঠে দৌড়ে গিয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন, একটু আগে যে মেয়েটাকে ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন, সেই মেয়েটাই নিচে ফুটপাথের ওপর পড়ে মরণযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, বাকিরা দৌড়াদৌড়ি করে নেমে গেল নিচে মেয়েটাকে সাহায্য করার চেষ্টায়।

ছাদ থেকে প'ড়ে মেয়েটার মুখ চোখের যে অবস্থা হয়েছিল, সে দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। রক্তে চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। সবাই মিলে ধরাধরি করে ওকে কাছের একটা বেদীর ওপর শুইয়ে দিল। অস্ফূট স্বরে কোনোরকমে মেয়েটা বলে উঠল, ''জল''। দারোয়ানও চিৎকার চেঁচামেচি শুনে তখন ঘর থেকে দৌড়ে এসেছে। সে মেয়েটার মিনতি শুনে ছুটে গেল ঘর থেকে জল আনতে, কিন্তু সে যখন এসে পৌঁছলো, তখন মেয়েটার আর জল খাওয়ার মতো অবস্থা ছিল না। এদিকে ততক্ষণে আশেপাশের লোকজনও ছুটে এসেছে। সবাই একই কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল, ''কে এ? এটা হোলো কি করে''? হঠাৎ কে একজন বলে উঠল, ''সব এই ব্যাটা দারোয়ানের দোষ। নিশ্চয়ই আফিম খেয়ে ঢুলছিল, তাই এই মেয়েটা ওপরে উঠতে পেরেছে''। যেই সে কথা বলা, সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোক উঠে বাঞ্ছারামকে ধরে বেধরক মারতে লাগল। হঠাৎ এসব দেখে পরাশরও দৌড়ে নেমে এলেন। বললেন, ''আপনারা মানুষ না জানোয়ার? ওর কোন দোষ নেই, ওকে ছেড়ে দিন। এখন এদের নিয়ে চলুন হাসপাতালে, দেখা যাক বাঁচানো যায় কিনা''। ওঁর কোলে বাচ্চাটাও তখন কান্না বন্ধ করে হেঁচকি তুলতে শুরু করেছে।

হাসপাতালে পৌঁছে দেখা গেল, মেয়েটা রাস্তাতেই মারা গেছে। বাচ্চাটাকে ভর্তি করা হ'ল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। ডাক্তাররা বললেন বাহাত্তর ঘন্টা না গেলে কিছু বোঝা যাবে না। সারা রাত হাসপাতালে কাটিয়ে ভোরবেলা উঠে পরাশর অফিসে গেলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে সকলের মধ্যে একটা হৈচৈ পড়ে গেল। শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা খোদ চার্লস সাহেবের কানে গিয়ে উঠল। খুব চিন্তিত দেখাতে লাগল তাঁকে। শত হলেও তাঁরই সংস্থার চত্বরে ঘটনাটা ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রধান আইনজ্ঞদের ডেকে পাঠালেন। আলোচনা করে ঠিক হ'লো, যদি আদালতে মামলা ওঠে তাহ'লে বলা হবে যে অফিস বন্ধ হওয়ার পরে ঘটনাটা ঘটেছে, তাতে শাস্তি যদি দায়েরও হয়, তা অনেকটাই কম হবে। কিন্তু কে ছিল সেই মেয়েটা? আর কেনই বা তাকে এই চরম পদক্ষেপ নিতে হ'ল? অনেক খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল, ওর নাম ছিল অনুভা। খুবই সাধারণ অথচ ভদ্র ঘরে জন্ম হয়েছিল ওর। বেশি পড়াশুনা করার সুযোগ হয়নি, কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস, ওর বিয়ে হ'ল যার সাথে সে ছিল মদখোর ও চরম লম্পট। একাধিক নারীর সাথে সহবাস করতো সে, শহরের নিষিদ্ধ এলাকাতেও যাতায়াত ছিল তার। কথায় কথায় অনুভার ওপর অকথ্য অত্যাচার করতো, মারধোরও করতো। ওদের যখন সন্তান জন্মগ্রহণ করলো, তখন ওর অত্যাচার যেন চরমে গিয়ে ঠেকল। অনুভার ওপর মিথ্যা অভিযোগ আনল যে ওই সন্তান আদৌ ওদের নয়। অনুভা অন্য কারও সাথে সহবাস করার ফলে ওই সন্তানের জন্ম হয়েছে। দিনের পর দিন ওর ওপর অত্যাচার যেন বেড়েই চলল। আর সহ্য না করতে পেরে একদিন রাগে, দুঃখে, অপমানে অনুভা ওর শিশু সন্তানকে নিয়ে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ল। ঠিক করলো ওর আর ওর সন্তানের প্রাণের আহুতি দিয়ে এই দুঃসহ জীবনের অবসান ঘটাবে। শেষ পর্য্যন্ত অভাগী ওর সেই অন্তিম ইচ্ছা চরিতার্থ করতে সক্ষমও হ'ল, কিন্তু কেন ও কীভাবে যে সে চার্লস সাহেবের অফিসটাই বেছে নিয়েছিল, তা কেউ জানে না।

বাচ্চাটা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল। ওকে যখন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ছেড়ে দিলেন, মায়ার বশে পরাশর ওকে বাড়ি নিয়ে গেলেন ওকে নিজের সন্তানের মতো করে বড় করে তোলার জন্য। ওঁর সাথে সাথে ওঁর ভাই, বোন ও পরিবারের অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের আদর, ভালোবাসা ও লালন পালনে বেড়ে উঠতে লাগল শিশুটি। অবশ্য ওকে দত্তক নিতে বেশ কাঠখর পোড়াতে হয়েছিল পরাশরকে। আদালতে ওঁকে প্রমাণ করতে হয়েছিল যে ওই শিশুটিকে ওর নিজের পিতার কাছে ফিরিয়ে দিলে ওর অবহেলা হবে, এমনকি প্রাণহাণিরও আশঙ্কা থাকতে পারে। মামলার শুনানির ভিত্তিতে শিশুটির পিতাকে গ্রেফতার করল পুলিশ ও তাকে দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ল। পরাশর নিশ্চিন্ত হ'লেন যে বর্বরটা আর বাচ্চাটার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ভগবান ওকে বাঁচিয়ে ওঁর হাতে তুলে দিয়েছেন, তাই ছেলেটির নাম দিলেন শুভাশিস।

দেখতে দেখতে অনেক বছর কেটে গেল। শুভাশিস বেশ বড় হয়ে উঠেছে। পরাশরই এখন কোম্পানীর চীফ অ্যাকাউনটেন্ট। চার্লস সাহেব তাঁর ব্যবসাপত্র বিক্রী করে দিয়ে দেশে ফিরে গেছেন। কোম্পানীর মালিক এখন দেওকিষণ ঝুনঝুনওয়ালা। এই কয়েক বছরে কোম্পানীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। স্যুট-টাই -এর চল উঠে গেছে। দেওয়ালের ট্যাপেস্ট্রীগুলো উঠে গিয়ে তার যায়গায় এখন এসেছে রামায়ন-মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনার চারিত্রিক রুপায়ণ। একটা বড় পূজোর ঘর তৈরী হয়েছে, সেখানে রোজ দেওকিষণজী দু'ঘন্টা ধরে পূজো করেন। এছাড়া গোটা অফিসটাকে শীততাপনিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। প্রায় রোজই বেশ দেরী ক'রে বসে কাজ করেন পরাশর। অনেক দায়ীত্ব ওঁর কাঁধে। এমনই এক সন্ধ্যাবেলার কথা। আজ একটু বেশীই দেরী হয়ে গেছে। উনি ছাড়া অফিসে আর কোন কর্মী নেই। রেডিওতে ভারত-ইংল্যান্ডের ক্রিকেট ম্যাচের ধারাভাষ্য শোনার জন্য বাকিরা আজ একটু তাড়াতাড়িই দেওকিশনজির সম্মতি নিয়ে বাড়ি চলে গেছে। পরাশরের ওতে কোনদিনই খুব একটা আগ্রহ নেই। কখনো ইচ্ছা হ'লে হয়তো একে ওকে জিজ্ঞেস ক'রে খেলার খবর নেন। হঠাৎ কাজ করতে করতে আলো নিভে গেল। নিচে দারোয়ান তাড়াতাড়ি ক'রে ডিজেল জেনারেটর চালানোর চেষ্টা শুরু করে দিল। পরাশরের ইচ্ছা হ'ল কোথাও গিয়ে একটু মুক্ত হাওয়া সেবন করেন। কি ম'নে হ'ল সোজা সিঁড়ি বেয়ে ছাদে চ'লে গেলেন। আকাশটায় আজ বেশ মেঘ ক'রে আছে। সেই মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আবছা ভাবে মাঝে মাঝে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। একটা ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে, মনে হচ্ছে যে কোন সময়ে মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হবে। পরাশর ছাদের পাঁচিলের একটা অংশে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আকাশটার দিকে দেখতে লাগলেন। ঝোড়ো হাওয়াটার ফলে চারদিকটা বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তার ছোঁয়া গায়ে লেগে বেশ আরাম লাগছে। খানিকটা অজান্তেই নিজের মনে গুন গুন ক'রে গান গাইতে গাইতে একটা সিগারেট ধরালেন। মনের চিন্তাধারা বাঁক নিল শুভাশিসের দিকে। সেই ছোট্ট ছেলেটা এখন কত বড় হয়ে গেছে! ওর ছোটবেলায় বলা দু'একটা মজার কথা ম'নে পড়ায় নিজের মনেই হেসে উঠলেন। সিগারেটটা শেষ করতে করতে জেনারেটর চালু হ'য়ে গেল। শেষ সুখটানটা দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেটা জুতোর তলায় ঘষে নিভিয়ে দিয়ে ছাদের দরজার দিকে এগোলেন নিচে যাওয়ার জন্য। হঠাৎ কোথা থেকে একটা দমকা হাওয়া এসে দরজাটাকে ঠেসে বন্ধ করে দিল। খুলতে গিয়ে দেখলেন, দরজাটা ভীষণ শক্ত হয়ে আটকে গেছে। পরাশর যথেষ্ট শক্তিশালী মানুষ, যৌবনকালে রীতিমতো ব্যায়াম করতেন রোজ, কিন্তু তাঁর পক্ষেও সে দরজা খোলা সম্ভব হোল না। এতক্ষণ খোলা দরজাটা দিয়ে সিঁড়ির টিম টিম করে জ্বলা এমারজেন্সী আলো এসে পড়ায় চারদিকে দেখতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছিল না। এখন দরজাটা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে খুব কাছের জিনিসও ঠাহর করতে কষ্ট হচ্ছে। কেমন একটা হাড়কাঁপানো শীত লাগতে লাগলো সারা শরীরে। হঠাৎই যেন কোনো অদৃশ্য ইশারায় ঝোড়ো হাওয়াটা বন্ধ হয়ে গেল। একটা অজানা আতঙ্ক পরাশরের সারা শরীরকে গ্রাস ক'রলো। কী ক'রবেন ভাবছেন, এমন সময় ছাদের একটা কোনায় একটা সরু, অথচ তীব্র আলো ফুটে উঠল। বিস্ফারীত চোখে পরাশর দেখলেন, ধীরে ধিরে আলোটা আরও বড় পরিধি জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সাথে সাথে তার তীব্রতাও কিছুটা কমে আসল। ভয়ে ও বিস্ময়ে ওঁর এখন সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে, কপাল থেকে দরদর ক'রে ঘাম ঝরছে। আলোটা দেখতে দেখতে যেন একটা মানুষের আকার ধারণ করতে লাগল, চোখটা আরও অভ্যস্ত হলে দেখলেন, আকারটা যেন মুখে সাদা ঘোমটা দেওয়া একটা মেয়ের রুপ নিয়েছে। এরপর ধীরে ধীরে সেটা চলতে শুরু করে ওঁর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। পরাশর এখন যেন নড়াচড়ার সব শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। আকারটা ওর কাছাকাছি এসে হঠাৎই যেন দাঁড়িয়ে পড়ল, কিন্তু মুখটা ঘোমটার আড়ালে থাকার ফলে ঠাহর করা গেল না। এরপরের ঘটনাটা একেবারেই কল্পনার বাইরে। আকারটা যেন মনে হ'ল পরাশরের দিকে ঘুরে প্রণাম জানানোর ভঙ্গিতে মাথাটা একবার নত ক'রলো। তারপর অন্যদিকে ঘুরে চলতে চলতে অন্ধকারে কোথাও মিলিয়ে গেল। যেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝোড়ো হাওয়াটা হঠাৎ শুরু হয়ে গেল। বন্ধ দরজাটা

হাওয়ার ঝাপটে দুম ক'রে খুলে গেল। পরাশর শরীরের সমস্ত অবশিষ্ট শক্তি ও সাহস একত্রিত করে দৌড়ে সেই দরজার দিয়ে বেড়িয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

এই ঘটনার পর দশবছর কেটে গেছে। ওরিয়েনটাল মারকেনটাইলের চাকরীটা অনেকদিন হ'লো ছেড়ে দিয়েছেন। ওঁকে একবার কর্তৃপক্ষ একটা বেআইনি কাজ করার জন্য চাপ দিয়েছিল। তার প্রতিবাদে তখনই চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে চলে এসেছিলেন। এখন উনি অ্যাকাউন্টিং -এর একটা ছোটখাটো ফার্ম খুলে তা নিজেই চালান। সেই রাতের যে ঘটনা পরাশরের চোখের সামনে ঘটেছিল, কেউ কোনদিন আর তার পুনরাবৃত্তি দেখে নি। কোনসময় বিছানায় শুয়ে ঘটনাটা ম'নে পড়ে ওঁর। ভাবেন, তবে কি অনুভাই এসেছিল ওঁর সামনে সেদিন? কিন্তু ওঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সে কেন ক্ষণিকের জন্য? আর কেনই বা ওঁর দিকে মুখ ক'রে মাথা নত করেছিল? উনি যে শুভাশিসের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন, তার জন্য? না!না! সমস্তটাই নিশ্চয় ওঁর মনের ভুল। সারাদিনের প্রচণ্ড কাজের চাপের ফলেই মনের চোখ দিয়ে ওইসব ঘটনা দেখেছিলেন, ডাক্তারী ভাষায় যাকে বলে হ্যালুসিনেশন। কে জানে? কোনদিনই আর তার হদিশ মিলবে না।

Poila Baishakh and its history

Poila Baishakh is a momentous occasion where Bengalis welcome New Year with new hope and commitment. Everybody wishes that New Year brings prosperity and success in everybody's life. Local shopkeepers make their old account clear and introduce the good start of the new account (HalKhata). In this ceremony, Lord Ganesha is worshipped, mantras are chanted and swastikas are drawn on the accounting book. The tradition of serving sweet and tea to the customers on this occasion adds friendship in the business relation.

The day is marked to celebrate with family and friends. The entire community takes part in it. Music, dance, drama and several other enjoyments makes the day colorful. Daily routine is broken one time for good, it is the start of a new dream, new resolution! Special sweets and foods are prepared to celebrate this joyous occasion.

How did the calendar start in the middle of April? There is little history behind it. It is hard to believe that Bangla saal was not introduced by Bengalis but was introduced by a Mughal emperor, Akbar the Great. The old calendar year, Hegira Era had 31 lunar years which is equal to 30 solar years. It was causing an issue in the peasantry since the revenue was collected on the basis of lunar years whereas the harvest collection was matching closely with the solar ones. The lunar year consisted of 354 days but the solar years have 365 or 366 days. So there is always a difference of 11 or 12 days between the lunar and the solar years. As a solution to the issue, Tarikh-e-Elahi, a new calendar was introduced, which had the months as 'Vihisu, Khordad, Teer, Amardad, Shahriar, Aban, Azur, Dai, Baham and Iskander Miz. Nobody knows when it was changed to Baishakh, Jaishtha, etc. It is believed that these months, based on the names of the stars, were derived from the Shakabda which was introduced in 78 A.D.

Name of the Month	Stars
Baishakh	Bishakha
Jiashthya	Jaishtha
Ashara	Shar
Sraban	Srabani
Bhadra	Bhadrapada
Ashwin	Aswain
Kartik	Kartika
Agrahayon	Agraihon
Poush	Poushya
Magh	Magha
Falgun	Falguni
Chaitra	Chitra

Some claimed that the Bangla calendar was introduced by Shashanka, king of Bengal, in the memory of his conquest of Assam. But there is evidence that he conquered Benaras and moved towards Chilka Lake and never towards Assam.

After introducing Tarikh-e-Elahi, Akbar the Great also introduced the celebration of “Nawroze” or the celebration of the New Year's Day. The history says that Selim first met and fell in love with Meherunnisa (known as Nurjahan) on that day. Prince Khurram (known as the Emperor Shahjahan) first came across Mumtaz Mahal on that day too – whose romance is still reflecting on the white marble of Taj Mahal.

Since then, Poila Baishakh has been celebrated with great importance. Especially to Bengalis, Baishakh is a special month. It is the birthday month of their beloved poet Rabindra Nath Tagore. In most of the places, outside India, Tagore’s birthday is celebrated along with the celebration of the New Year. Time is very short in today’s busy life; Bengalis still do not forget to get together to celebrate the unity and to wish each other “Shubha Nababarsha!”

Amazing Facts

Tinny Datta

A hippo can open its mouth wide enough to fit a 4 foot tall child inside.

An average beaver can cut down two hundred trees a year.

Bubble gum contains rubber.

When it was invented, cotton candy's original name was "fairy fluff."

Duffel bags are named after a town of Duffel, Belgium, where they were first made.

Europe has no deserts, it is the only continent without one.

Honey is the only food that doesn't spoil.

It is impossible to sneeze with your eyes open.

Pigs do not sweat because they don't have sweat glands.

The state of Florida is bigger than England!

The winter of 1932 was so cold that Niagara Falls froze completely solid.

Do you believe in ‘Me time’?

Aradhana Bhattacharya

I am sure you must have been a bit taken aback by the no-so-common heading of my write up! But seriously, this is important. Yes, have you spent some ‘Me Time’ today?

Some of you might think what is ‘Me Time’?

It is the time that you only spend for yourself. No – not the Time - playing with your kids or doing laundry by yourself or cooking at home…No No No..

I am not saying all this is not important *but* spending some time just for your self is equally essential. Some of us may not feel the need for it as it is not very common practice in our culture as most of our predecessors found contentment in gratifying their families. The concept of 'self' was not given much importance.

The change in times brought about change in needs as well. It's equally important to do something for yourself right now, this minute, as it is to do anything for anyone else. Why bother? Because your health and happiness are at stake! Many of our telepathic minds may be thinking - with work and home I do not have any spare time at all. I wish there were more that 24 hrs in a day….Not an uncommon feeling after all!

Then let me ask you this: when was the last time you went for a relaxing pedicure unwinding in the vibrations of the message chair or read your favorite book lazily couched in a comfy chair *uninterrupted* on a Sunday afternoon or planted some flowers that you loved or simply took a long soak in the hot tub just to please yourself? **I hope not a very long time ago??!!!**
Research has proved that a large majority of the working moms have less and less time for themselves. This results in resentment which not only affects our health but sometimes our marriage, our relationship with kids and also our own self esteem.
A coworker once told me at lunch the other day how frustrated she was with life. On further probing she opened up and said she is loosing herself by just working 24/7.She felt that she is spending 8 hrs a day struggling at work and the rest of the day doing chores at home.

So what do we do to find an achievable solution to this silent problem that is crying out loud???
The solution is simple…
Try indulging in some 'Me Time', I dare you! At the same time let me warn you, after you try it you'll never be able to live without it!

So what can we do in this 'ME TIME'?

To start with, stop feeling guilty that you are spending this time just for yourself and not doing something for the family instead.
Understand this simple equation:
A Happy YOU = A Happy Family

Don't let work and family be the only voices when you plan. Try doing things that bring a smile to your face and enrich you with a sense of fulfillment.

Like What?

Snatch a few hrs from your busy schedule and go shopping by yourself with a bunch of like minded friends. Remember you do not *Have* to shop all the time. Some window shopping could be refreshing, not to mention -also keep you updated on what is the latest that season! For the ones who wants to exercise but have been pushing it aside for lack of time, go for a brisk walk twice or thrice a week after returning from work or even during weekends. This could provide you with the much needed exercise you have been craving for. Else if you are not the health conscious type, just indulge in a leisurely facial or pedicure either at a salon or at home. Watch some home improvement channels…cause 'Yes', the remote belongs to you too!!!… If you are the talented sort, do a curtain or an artwork for your home. Believe me; you have a lot to choose from. All you need is to *just start*.

The bottom line is just do something to entertain yourself. Remember a healthy body needs a happy mind. And if you are raising a brow and asking –"so what do you do to relax yourself?" – My answer would be "I just did this write-up in My 'Me Time.'"

Lost Soul

Nairita Nandy

She seems so perfect
Walking down the hallway
Flipping her hair
With a flawless expression

Her world seems so perfect
Her life seems just right
Who would guess that deep inside,
Deep inside….

She is fighting for a way out
She is searching for the meaning of life.
She's looking out the window
Searching for a ray of light.
But all see sees is the fog clogged up inside.

The rest of the world sees
A facade of perfection
She hides the pain
With a smile plastered onto her face.

Who would even think
That befind all that mascara, she's blind.
Her heart been broken so many times
She wonders if it had even been whole at all

She is fighting for a way out
She is searching for the meaning of life.
She's looking out the window
Searching for a ray of light.
But all see sees is the fog clogged up inside.

She is a lost soul
Without a path to follow
She's wandering
With no destination on her mind
Fleeing from her past
Searching for a future
But for now she's…

Fighting for a way out
Searching for the meaning of life
She's looking out the window
Searching for a ray of light.
But all see sees is the fog clogged up inside.

"If you cry because the sun has gone out of your life, your tears will prevent you from seeing the stars."

--Rabindranath Tagore

So Sick on a Cold Day

Moyna Ghosh

This is something that happened when I was in fourth grade. I went to the doctor with my mother on a Saturday for my annual check up. He checked me and said everything was okay but I had cold symptoms. After the checkup my mother took me to Panera, my favorite soup and salad restaurant.

It was evening when we got home and by that time I started feeling hot and unwell so I went straight to bed and did not tell my mother. I coughed all night; the sound of my cough was like a thump. Mom woke up and thought it was my pet hermit crab KaiKai wanting to eat something. She gave him some food, and went back to her room. The thumping sound continued. So she moved KaiKai to the guest room. When she heard it again, she moved KaiKai to the living room.

When I got up in the morning I was feeling tired and miserable. My mother called out, ”Moyna, wake up!” I could hear my mother calling out from the kitchen, as she was making tea. Her voice seemed so loud that I had to cover my ears with my hands and my head throbbed. Every sound that I was hearing seemed too loud. “Moyna, get up. Don’t waste your whole day in bed!” My mother called out again. I heard her footsteps coming towards my room – it seemed loud. “Mom, don’t come in, my head hurts.” I didn’t realize I was whispering. I heard my door open quietly. My mother looked worried. She went out of the room, and then came back with a thermometer. She put the thermometer in my mouth and observed. Beep, beep, beeeep! My mother winced and seeing her I got scared.

“102° F, Moyna you have to stay in bed, ” my mom said to me. I told her that I staying in bed was boring, so she said that I could watch the TV or even a movie. She also suggested that I could read Chasing Vermeer. I weakly got up from my bed, and went to my mom’s room. I got under the covers and turned on the TV. I watched a marathon of That’s So Raven on Disney Channel. Soon I could not stand watching the TV, so I turned it off and started reading Chasing Vermeer. I got tired of reading. Then my mother gave me some light toast and chicken noodle soup. I did not like the taste of it and thought about the yummy broccoli cheddar soup in a bread bowl that I ate at Panera just yesterday. My Mom told me that she too was thinking of turning in early as she was tired. The whole of last night, she told me, she had been moving Kaikai around the place as he had a disturbed night. She thought maybe KaiKai too was not well.

I asked my mother to dim the lights, and after she gave me the yucky medicine called Vicks 44D, I fell sound asleep. I woke up to see my mother sleeping beside me. I checked the time, it was 3 a.m. but I felt a lot better. I suddenly noticed that the outside was so bright and I was amazed since it was only 3 a.m. so it should be dark outside. I crept out of bed and fully opened the blinds and peered out. And I saw a most wondrous scene - everything was white and shinning! It had snowed in the night and the houses, the roads, the cars outside where all covered in white snow. It looked so beautiful and seemed like a magic land. I thought maybe I was dreaming and have reached the North Pole. If I wait a little longer then I will be able to hear the bells of Santa’s sleigh and see him coming down from the sky. I shut my eyes and pinched myself hard to see if I would wake up. “Ouch”, I cried aloud loudly, as I had pinched myself too hard. Suddenly I heard my Mom’s voice saying “Moyna! What are you doing out of bed?” “Mom, its snowing outside”, I cried out enthusiastically “come here and see how pretty the outside looks”. I ran to bed and dragged her to the window. She too was amazed at the beautiful white scenery outside.

We soon went to bed and fell asleep again. When I woke up again I saw that my mother was watching the news on TV. Looking at her I asked, “Mommy, what time is it? Am I really sick?” “You were very sick yesterday but now your temperature is 100 ° F. I still want you to take rest today”. So I just stayed in bed all day. My temperature came down to 98 ° F by the evening.

I stayed home all day in bed and thought to myself that although this was the most boring experience I have ever had, but the snow did make up for it. If I had not slept the whole of yesterday then I would have never woken up at 3 a.m. and then I would have missed the most beautiful ethereal experience in the whole wide world.

Friendly Dog
By Eleena Ghosh

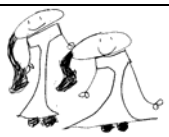

Two Friends
by Eleena Ghosh

A Turning Point

Suporna Chaudhuri

As I woke up this morn'
I just could've sworn
A pang of guiltiness
Struck me.

I knew what I was to eat
While wandering in the streets
Children are literally
Starving.

I go to school in peace,
Yet dangers never cease,
And some children go to school
With gas masks.

I simply take a few steps
And start complaining and sweat,
While many children work
Day and night.

I always know that my family
Will be there for me,
While some children
Unknowingly become orphans.

I know that my life
Won't contain those children's strife,
Yet.....
I still feel guilty.

And as New Year comes along
I hope nothing goes wrong
And that no child cries
Because of devastation.